রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'

ভূমিকা:

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক পর্যায় শুরু হয়েছে সেই পর্বে অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে যে সাহিত্য-স্রষ্টারা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বমানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে চারজনের নাম করতে হয়। তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)। এই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য মনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যাপ্তি, প্রগতিশীলতা, জ্ঞানান্বেষী প্রবণতা বিজ্ঞানচেতনা, আত্মবিশ্বাস এবং রোমান্টিকতাবোধের সমন্বয়। মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজের রক্ষণশীলতা এবং দৈব নির্ভরতা থেকে এই প্রবণতা ছিল মুক্ত। তারই ফলে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী জ্ঞানচর্চামূলক রচনায়, মধুসূদনের নবজাগ্রত চিত্তের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, আত্মশক্তি উদ্বোধন ও স্বাধীনতার স্পৃহার মধ্যে দিয়ে সেই মুক্ত মনের উদ্বোধন ঘটেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে গভীর সংযোগ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিও প্রগাঢ় অভিনিবেশ সমন্বয়িত হয়েছে তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ (১৮৬১)। এই কাব্যটিকেই বাংলার নবজাগরণের চারিত্রসূচক প্রথম কাব্য বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও দেশপ্রেমের অভিব্যক্তির সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সারসত্যের সম্মিলন ঘটেছিল। সেই সঙ্গে বঙ্কিম-সাহিত্যে রোমান্টিকতার চেতনা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন দিক থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রোমান্টিক অনুভবের যে নিহিত

প্রানশক্তি তাকে পূর্ন প্রস্ফুটিত করে তুললেন তাঁর কবিতায়। উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকেই রবীন্দ্র-কবিতায় যে সৌন্দর্যচেতনা, প্রকৃতি চেতনা, বিশ্বাত্মবোধ, প্রেম ও আধ্যাত্মিক চেতনা এবং বিশ্ব মানবতাবোধের সমন্বয় ঘটেছে তার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্রিয় ছিলেন বিশশতকের প্রথম চারদশক পর্যন্ত। উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৯-২০ পর্যন্ত তাঁর কাব্য ধারার অনুসরনেই প্রধানত বাংলা কবিতা প্রবাহিত হয়েছিল। ভাষা, ছন্দ, উপমা-চিত্রকল্পের দিক থেকেও তিনিই ছিলেন আদর্শ।

অবশ্য ১৯২০-২১-এর কাল থেকে কোনো কোনো কবির লেখায় ভাষা, বাস্তবচেতনা, বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের স্বাক্ষর ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগন্য। ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবির রচনায় বিশ্ব-চেতনা, বাস্তববোধ এবং ব্যক্তিমনের অনুভবের ধরন পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তন এসেছিল সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য ধারায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি-প্রবাহ অন্তত অর্ধ শতাব্দী কাল ব্যাপ্ত করে সংস্কৃতিমনস্ক, শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত বাঙালির চিন্তন, মনন, ভাবাবেগ, সমাজবোধ, বিশ্ববোধ, দেশচেতনা এবং সাহিত্য-প্রাননাকে প্রধানভাবে ধারন করেছে। রবীন্দ্রনাথ গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ — সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে সৃষ্টিশীল এবং নতুন ধারার প্রবর্তক। এখানে আমরা তাঁর কাব্যসৃষ্টি-ধারা অনুসরনে কয়েকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব।

P.T.O.

রবীন্দ্র কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

পাঠ্য আছে কয়েকটি মাত্র কবিতা। কিন্তু সেই কবিতাগুলি কোন্ কোন্ কবিতা-সংকলন থেকে গৃহীত হয়েছে এবং সেই সংকলনের মূল বৈশিষ্ট্য কী তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কালানুক্রমিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সংকলনগুলির উল্লেখ করা হল।

১. সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২)

[কবিচিত্তের রোমান্টিক চেতনার প্রথম অস্ফুট প্রকাশ।]

২. প্রভাতসংগীত (১৮৮৩)

[রোমান্টিক অনুভূতির মুক্ত উচ্ছ্বাস এবং ব্যাপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।]

৪. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী - ১৮৮৪

৩. ছবি ও গান (১৮৮৪)

[বিশ্ব সৌন্দর্যের সঙ্গে সচেতন সম্পর্ক স্থাপন।]

৫. কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)

[ভাবের ও বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। দেহ চেতনার রোমান্টিক কাব্যিক অভিব্যক্তি।]

৬. মানসী (১৮৯০)

[এই সংকলনের কবিতাগুলিতে কবির মনের দার্শনিক উপলব্ধি এবং রোমান্টিক চেতনার অতীন্দ্রিয় অভিসার পরিস্ফুট হয়েছে। কবি কবিতার ছন্দ ও ভাষা সম্পর্কেও বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছেন।]

৭. সোনার তরী (১৮৯৪)

[বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ এবং সীমার বন্ধন ছিন্ন করে বিমূর্ত অসীমতার অনুভূতিকে কবি ক্রমে ধারণ করতে চাইছেন এই সংকলনের কবিতাগুলিতে। সেই সঙ্গে এই মর্ত্যভূমির প্রতি কবির গভীর অনুরাগও প্রকাশ পেয়েছে। এই সংকলনের 'বসুন্ধরা' কবিতাটি পাঠ্য আছে।]

৮. চিত্রা (১৮৯৬)

[কবির রোমান্টিক চেতনা, মর্ত্য চেতনা এবং নিজস্ব কবি জীবনের অন্তর-তলের সৃষ্টি প্রেরণা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি এই সংকলনে বিচিত্র সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে। 'চিত্রা' সংকলন থেকে দুটি কবিতা পাঠ্য আছে। 'জীবনদেবতা' এবং '১৪০০ সাল'।]

৯. চৈতালি (১৮৯৬)

['চিত্রা' সংকলনের কবিতাগুলির ভাবধারাই প্রবাহিত হয়েছে।]

১০. কণিকা (১৮৯৯)
[দুই থেকে দুই পঙক্তির মধ্যে রচিত, জীবনের গভীর অভিজ্ঞতাজাত তত্ত্ব কথায় সংকলিত ছোটো কবিতা।]

১১. কল্পনা (১৯০০)

[রোমান্টিক কল্পনার বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি কবিচিত্তের মুগ্ধতা এবং একাত্মতা অনুভব করা যায়।]

১২. কথা (১৯০০)

[আখ্যান ভিত্তিক কবিতা। বৌদ্ধযুগ এবং মধ্যযুগের ইতিহাস থেকেও আখ্যান গ্রহণ করা হয়েছে।]

১৩. কাহিনী (১৯০০)

[মহাভারত ভিত্তিক নাট্যকাব্য রচনা।]

১৪. ক্ষণিকা (১৯০০)

[এই সংকলনের কবিতায় কবির বাক্‌ভঙ্গিতে সহজ চলিত ভাষা এসেছে। সেই সঙ্গে বাস্তব জীবন ও প্রাত্যহিক সংসারের অভিজ্ঞতা আর উপভোগ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি একটি জীবন-দর্শনে পরিণত করেছেন।]

১৫. নৈবেদ্য (১৯০১)

[সনেট-সংকলন। কবি ঈশ্বরভাবনার সঙ্গে জীবনের মহৎ আদর্শ এবং স্বদেশের অনুভব যুক্ত হয়েছে। এই সংকলনের একটি কবিতা পাঠ্য আছে।]

১৬. স্মরণ (১৯০৩)

[পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে উৎসর্গীকৃত কবিতা।]

১৭. শিশু (১৯০৩)

[শিশুকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতা।] ~~বৈচিত্র্যের কোমলতা ও আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে জীবন প্রসঙ্গে দার্শনিক বোধ মিশে রয়েছে।~~

~~১৮। খেয়া~~

~~[বিভিন্ন ধরনের প্রতীকের মধ্যে দিয়ে অনেক কবিতাতেই ঈশ্বর ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে দার্শনিকতা ও রোমান্টিক ভাবনা~~

১৮. উৎসর্গ (১৯০৩)

[রোমান্টিকতা ও দার্শনিকতা বোধের সমন্বয় কবিতাগুলিতে অনুভব করা যায়।]

১৯. খেয়া (১৯০৬)

[বিভিন্ন ধরনের প্রতীকের মধ্যে দিয়ে অনেক কবিতাতেই ঈশ্বর ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে দার্শনিকতা ও রোমান্টিক ভাবনাও প্রকাশ পেয়েছে। এই সংকলনের 'শুভক্ষণ' কবিতাটি পাঠ্য আছে।]

২০. গীতাঞ্জলি (১৯১০)

[রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে গান রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। এই গানগুলির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন নিজে। 'Song offerings' নামের সেই ইংরেজি সংকলনটি ১৯১৩ তে নোবেল পুরস্কার পায়। এই সংকলনের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি পাঠ্য আছে। 'ভারততীর্থ' কবিতায় অবশ্য ভারতের ইতিহাস ও দার্শনিকতাবোধের সঙ্গে কবির দেশপ্রেমের ধারনা মিশ্রিত হয়েছে।]

এই কবিতায় আধ্যাত্মিকতাই প্রধান সুর নয়।

২১. গীতিমাল্য (১৯১৪)

২২. গীতালি (১৯১৪)

[উল্লিখিত দুটি গীতি-সংকলনের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'র ভাবানুষঙ্গ ও উপলব্ধি প্রবাহিত হয়েছে।]

২৩. বলাকা (১৯১৬)

['মানসী' যেমন কবিজীবনের একটি পর্বান্তর সূচিত করেছিল 'বলাকা'ও তেমনই একটি পর্বান্তরের চিহ্ন ধারণ করে। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি, যেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ বিপন্ন; অন্যদিকে 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) পত্রিকায় রক্ষণশীল প্রাচীনকে বর্জন করে নবীন তরুণ প্রাণশক্তির যে আহ্বান জানিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী, তাঁরই প্রেরণায় 'বলাকা'-র কবিতায় নতুন দর্শন, প্রাণ-চাঞ্চল্য, জীবনের গতিবেগ ইত্যাদি পরিস্ফুট।]

২৪. পলাতকা (১৯১৮)

[এই সংকলনের রচনায় বাস্তব জীবন, বাস্তব সংসারের মধ্যে মানব-সম্পর্কের বিরহ, মিলন, দুঃখ, আনন্দের সমবায়ে গড়ে উঠেছে কবিতা।]

২৫. শিশু ভোলানাথ (১৯২২)

[এই সংকলনের কবিতাগুলিতে পরিণত বয়সের কবির অন্তরের শৈশব-স্মৃতির মাধুর্য সঞ্চারিত হয়েছে।]

২৬. পূরবী (১৯২৫)

[কবির বয়স তখন ষাট-ঊর্ধ্ব। বিদেশ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং জীবনবোধের বিচিত্র বিস্তারের অনুভূতি থেকে জাত কবিতাগুলিতে বিদায়ের সুর এবং জীবন-বৈচিত্র্যের আনন্দ ও প্রেম-স্মৃতি মিলিত হয়েছে।]

২৭. লেখন (১৯২৭)

[দুই থেকে চার পঙক্তির মধ্যে রচিত গভীর দার্শনিক বোধ ও সৌন্দর্যবোধের কবিতা।]

২৭. বনবাণী (১৯৩১)

[রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতি-মুগ্ধ কবি। তাঁর সেই প্রকৃতি-মুগ্ধতার সঙ্গে পরিবেশ চেতনা সম্পর্কিত ভাবনা ছিল অবিচ্ছিন্ন। 'বনবাণী'-র কবিতাগুলিতে সেই চেতনার প্রকাশ।]

২৮. মহুয়া (১৯২৯)

[কবি জীবনের পরিণত পর্বে নারী ও প্রেমভাবনা সম্পর্কে তাঁর মনে নতুন ভাবাবেগের তরঙ্গ এসেছিল মহুয়ার কবিতায়, তারই অভিব্যক্তি।]

~~২৯. বিচিত্রিতা~~

~~[বিভিন্ন বিচিত্র রসের কয়েকটি কবিতার সংকলন।]~~

৩০. পরিশেষ (১৯৩২)

[নাম থেকেই বোঝা যায় যে, জীবনের শেষ পর্বের উপলব্ধিকে কবিতায় প্রকাশ করতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কবিতাগুলিতে সেই চেতনাই প্রকাশ পেয়েছে।]

৩১. পুনশ্চ (১৯৩২)

[এখানেও নাম থেকে বোঝা যায় সহসা কবির মনে আবার নতুন কিছু বলবার ও সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এই সংকলনের কবিতায় দেখা যায় দুটি নতুন দিক। কবি সচেতনভাবে গদ্যরীতির কবিতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে সংসারের সাধারণ মানুষকে, জীবনের আপাত সাধারণত্বকে মূল্য দিয়েছেন কবিতায়।]

(১৩২)

৩২. বিচিত্রিতা (১৯৩৩) (ব)

[বিভিন্ন বিচিত্র রঙের কয়েকটি কবিতার সংকলন]

৩৩. বীথিকা (১৯৩৫)

[এই কবিতাগুলিতে যেন জীবনের শেষ পর্বে এসে ফিরে দেখছেন যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখকে।]

৩৫. - বীথিকা (১৯৩৫)

৩৪. শেষ সপ্তক (১৯৩৫)

৩৬. পত্রপুট (১৯৩৬)

৩৭. শ্যামলী (১৯৩৬)

[এই দুটি সংকলনের কবিতায় কবির জীবনের দার্শনিক প্রতীতি-র উন্মোচন ঘটেছিল।]

~~৩৪. লেখন~~

~~৩৫. স্ফুলিঙ্গ~~

~~[রবীন্দ্রনাথ দুই থেকে ছয় পঙক্তির অনেক কবিতা লিখেছেন। সেগুলিতে কোথাও তির্যক কটাক্ষের সুরে জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে, কখনও অতি সংক্ষিপ্ত বাচনে ধরা আছে গভীর জীবনবোধ ও দার্শনিক উপলব্ধি।]~~

~~শ্যামলী (১৯৩৬)~~

৩৮. খাপছাড়া (১৯৩৭)

৩৯. ছড়ার ছবি (১৯৩৭)

[ছড়ার ধরনে বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। আপাত হাস্যরসের মোড়কে জীবনের বাস্তবতা সেগুলিতে উঠে এসেছে।]

৪০. প্রান্তিক (১৯৩৮)

৪১. সেঁজুতি (১৯৩৮)

৪২. প্রহাসিনী (১৯৩৮)

৪৩. আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯)

৪৪. নবজাতক (১৯৪০)

৪৫. সানাই (১৯৪০)

~~[৪৮. জন্মদিনে (১৯৪১) [জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ কবিতা-সংকলন।]~~

[এই সংকলনগুলিতে জীবনের শেষপর্বে কবি তাঁর জীবন অনুভবকে ফিরে দেখতে চেয়েছেন। দার্শনিকতার সঙ্গে মিশেছে মর্ত্যভূমি সম্পর্কে কবির আন্তরিক অনুভবের বিভিন্ন দিক। আবার নিজের জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি সহ যেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন নিজের জীবনের সম্পূর্ণ বৃত্তকে। পাঠ্য।]

৪৬. রোগশয্যায় (১৯৪০)

৪৭. আরোগ্য (১৯৪১)

৪৮. জন্মদিনে (১৯৪১)

[রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্তই, অসুস্থ শরীরেও কবিতা রচনা করে গেছেন। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর জীবন-অনুরাগ এবং মর্ত্যপ্রীতি এই সংকলনগুলির কবিতায় প্রকাশিত। কবি শান্তভাবে জীবন-শেষের প্রতীক্ষা করছেন। কোথাও তিক্ততা নেই, আছে জীবন-তৃপ্তি, নিজস্ব জীবন দর্শনে উদ্ভাসিত এক সৃষ্টিশীল শিল্পীর অন্তরের পরিচয়।] 'জন্মদিনে' সংকলনভুক্ত 'ঐকতান' কবিতাটি পাঠ্য।

'জন্মদিনে' রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে শেষ প্রকাশিত কবিতা-সংকলন। সংকলন এর পরে মরণোত্তর প্রকাশ —
- ছড়া (১৯৪১),
- শেষ লেখা (১৯৪১)
- স্ফুলিঙ্গ (১৯৪৫)
- চিত্রবিচিত্র (১৯৫৪)

— ০ —

পাঠ্যকবিতা : বসুন্ধরা — ~~[illegible]~~

• সাধারণ পরিচয় :

'বসুন্ধরা' কবিতাটি 'সোনারতরী' (১৮৯৪) সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটির রচনার তারিখ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ কার্তিক অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। আমরা আগেই বলেছি, 'সোনারতরী' সংকলনের কবিতাগুলিতে বিশ্বের বিপুল বিস্তৃত এবং সীমাহীন পারিধি কবির চিত্তে বিস্ময়মুগ্ধতা জাগ্রত করে, তার পরিচয় যেমন আছে, তেমনই আছে এই মর্ত্য পৃথিবীর প্রতি কবির সুগভীর অনুরাগের এবং আকর্ষণের অনুভব। 'বসুন্ধরা' কবিতাটিতে এই দুটি অনুভূতি মিশ্রিত হয়েছে, তবে মাটির পৃথিবী মর্ত্যভূমির যে বাস্তবতা তার প্রতি কবির নিবিড় আকর্ষণের উপলব্ধিই হয়ে উঠেছে প্রধান।

• গঠন : কবিতাটি দীর্ঘ ~~এবং~~ (এখানে কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি গুনে বসিয়ে দেবে।) চোদ্দোমাত্রার মিশ্রবৃত্ত পয়ারে — ~~[illegible]~~ আট এবং ছয় মাত্রাবিশিষ্ট দুই পর্বের পঙ্‌ক্তির সমন্বয়ে রচিত। কবিতাটির গঠন অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতোই চরণান্তরে ভাবকে ধারণ করেছে। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ভাব সম্পূর্ণ হয়ে যায়নি। তবে ~~[illegible]~~ কবিতাটিতে অন্ত-মিল আছে বলে (এই) রবীন্দ্র-প্রবর্তিত (পয়ার) ছন্দকে 'মমিল ~~[illegible]~~ (অমিত্রাক্ষর)' বা 'প্রবহমান' বলা হয়।

• কবি কবিতার প্রথমেই কল্পনা করেছেন যেন তিনি এই বসুন্ধরা অর্থাৎ পৃথিবীর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের মধ্যে মৃত্তিকাময়ী ধরণীতে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল বাসনা উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠেছে। এই বিশাল পৃথিবী কীভাবে বিশ্বের ভূ-প্রকৃতির বহুবিধ বৈচিত্র্যকে ধারণ করেছে তা তিনি অনুভব করেন। এই বিশাল জগতের সঙ্গে তিনি মিলিতে চান। তিনি রুদ্ধ গৃহে বসে থাকতে চান না।

• কবিতার প্রথম অংশে তিনি সেই বাসনাকে ব্যক্ত করেছেন। কবিতার প্রথম তিরিশ পঙ্‌ক্তিতে এইভাবে বিশ্বের সর্বত্র বিচরণ হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

• তারপর তিনি এই বিশ্বের বৈচিত্র্যের অনন্ত সৌন্দর্যকে নিজের অনুভূতির মধ্যে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। "কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে / দূর দূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে/ চাহিয়া সম্মুখে।"

• প্রথমে তিনি পর্বত-শিখর, তুষারাবৃত দেশ যেন মহাদেবের তপোবন, পর্বত বেষ্টিত নীল সরোবর এই দৃশ্য কল্পনায় দেখেছেন।

• তারপর সমুদ্রতীরে মৎস্যজীবীদের গ্রাম; নদী-বেষ্টিত ভূমির সরসতা স্মরণ করেছেন।

• আরবদেশের মরুভূমিতে; তিব্বতের পাহাড়ে; বৌদ্ধমঠ; পারস্যের গোলাপ-কাননে; অশ্বারোহী তাতারদের জীবনযাপনে; আবার চিন ও

জাপানের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। (আরব, তিব্বত, পারসিক, তাতার, জাপান ও চিনের নাম [redacted] আছে ↑ লক্ষ্যণীয় ভালো করে দেখে নেবে।)

• হিংস্র অরণ্য, [redacted] ব্যাঘ্রের বিচরণ, সেই বিপজ্জনক জীবনকেও তিনি অনুভব করতে চেয়েছেন।

• কবিতাটিতে এরূপার ঘুরে ফিরে এই কথাগুলি বারবার আবৃত্ত হয়েছে।

• রবীন্দ্রনাথ চিরকাল প্রকৃতিপ্রেমিক। তাই ফুল, ফল, বৃক্ষ, তৃনাঙ্কুর, নীলাকাশ, সোনালি ধানের ক্ষেত, শরৎকালের আলো, সন্ধ্যার আকাশের চাঁদ, জ্যোৎস্না — এই সবের সংস্পর্শে কবি যে গভীর আনন্দ পান সেকথা বারবার তিনি উচ্চারন করেছেন।

• কবিতাটির শেষ পঁয়তাল্লিশ পঙক্তির শুরুতে কবি কল্পনা করেছেন যে একশো বছর পরে তিনি যখন রক্তমাংসের শরীরে আর পৃথিবীতে থাকবেন না তখন কি তিনি একেবারেই থাকবেন না? লক্ষণীয় এই পঙক্তিগুলি — "আজ শতবর্ষ-পারে / এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে / [redacted] কাঁপিবে না আমার পরান?" এরূপার অনেকগুলি বাক্যে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সশরীরে না থাকলেও তাঁর প্রান, হৃদয় এবং আত্মা এই বসুন্ধরার

বুকে মিলিত হয়ে থাকবে। কবিতার শেষে তিনি এই বসুন্ধরাকে জননী সম্বোধন করে এবং নিজেকে বসুন্ধরার সন্তানরূপে অভিহিত করে বারবার বলতে চেয়েছেন যে তিনি এই জননী বসুন্ধরার বুকে চিরকাল লগ্ন থাকতে চান। (শেষ তিন-চার পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য)

- প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময় কবি জমিদারির কাজ দেখার জন্য শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলিতে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি সাধারণত থাকতেন পদ্মানদীর উপর একটি বোট-এ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি কলকাতা শহর, নাগরিক পরিমণ্ডল, বাংলার গ্রামের নিকট সংস্পর্শে বিস্তীর্ণ প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি যেই প্রথম তিনি বাস করেছিলেন। কাজেই 'সোনারতরী' পর্ব থেকে সাধারণ মানুষের জীবন আর প্রকৃতির সৌন্দর্য—এই দুটি অভিজ্ঞতা মিলিত হয়ে তাঁর অনেক কবিতা ও গল্পের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পও এই পটভূমিতে লেখা।

- সবশেষে বলা যায় বিশেষভাবে এই সময়ে তাঁর চিত্তে এই মর্ত্যপ্রীতির স্ফুরণ ঘটেছিল; কিন্তু তারপর সারাজীবনই এই প্রকৃতিকাময়ী ধরণীর প্রতি তাঁর অনুরাগের বন্ধন ছিল অটুট।